ঃ যোগাযোগ ঃ
প্রতাপদীঘি লোক বিজ্ঞান সংস্থা, পূর্ব মেদিনীপুর, শোভনলাল সাহু - ৯৭৩২৬৮১১০৬, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা- ৯৩৩২২৮৩৩৫৬

বিজ্ঞান অন্বেষক

ভিতরের পাতায়
ফ্লোরাইড অজ্ঞতা ও ফ্লোরোসিসের বাস্তবতা, ভেজাল খাদ্যের রমরমা, কুসংস্কার, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, হিরোশিমা, মরণোত্তর চক্ষুদান।

বর্ষ-১২ সংখ্যা - ৬ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর RNI No. WBBEN/2003/11192 মূল্য : ২ টাকা

বেঙ্গল ফ্লোরিকান

'বেঙ্গল ফ্লোরিকান' এক ধরণের দুর্লভ 'Bustard' জাতীয় পাখি। 'বেঙ্গল বস্টার্ড' নামেও তাই ডাকা হয় একে। এটির বিজ্ঞানসম্মত নাম *'Houbaropsis bengalensis'* নামে যেমন সুন্দর, রূপেও তেমনই আকর্ষনীয় এই বেঙ্গল ফ্লোরিকান। পুরুষ পাখির মাথা, গলা ও দেহের নিম্নাংশ কালো, পিঠের রঙ হলদেটে ধূসর, ডানা দুটি দুধ সাদা। যদিও কেবলমাত্র উড়ন্ত অবস্থাতেই সুন্দর সাদা ডানা দুটি দৃশ্যমান হয়। নতুবা দেহের দুই পাশে দুটি সাদা দাগের মতই দেখতে লাগে। পুরুষের মাথায় আবার লম্বা ঝুটি থাকে। প্রজননকালে এদের বুকের নীচে এক গোছা ঝুলন্ত পালক তৈরী হতে দেখা যায়। পা ও পায়ের পাতা হলুদ রঙের। স্ত্রী দেহে কিন্তু পুরুষদের মতো সাদা কালোর এই বর্ণ বৈচিত্র অনুপস্থিত। মাথায়

এরপর 4 পাতায়

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস

ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের ইতিহাস ঃ অন্য যে কোনো বিপর্যয়ের তুলনায় ভূমিকম্প সম্পূর্ণ আলাদা কারণে সংঘটিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর থাকে না কোনো আগাম সর্তকতা এবং তাই থাকে না কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা। ভূমিকম্পের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ার হাত থেকে জনজীবন, স্থাপত্য, বাড়িঘর বাঁচাতে হলে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস যে অত্যন্ত জরুরি এ কথা মানুষ ভেবেছিল বহু বছর আগে। প্লেট টেকটনিক তত্ত্বের আবিষ্কারের অনেক আগে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে ভূতত্ত্ববিদ হ্যারি রীড সম্ভবত প্রথম ভূমিকম্পের পূর্বাভাস সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। তাঁর মতে ভূত্বকে চ্যুতি বরাবর পীড়নের মাত্রা সঠিকভাবে গণনা করতে পারলে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। এরপর এ নিয়ে আর বেশিদুর এগোনো সম্ভব হয়নি। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ডাইলেটেনসি তত্ত্বের অবতারণা করেন যা সারা পৃথিবীতে সাড়া ফেলে দেয়। এর সাহায্যে স্যানআনড্রিয়াস অঞ্চলে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়। প্রায় একই সময়ে ভূমিকম্পের পূর্বাভাসে 'সিসমিক গ্যাপ' নিয়ে গবেষণা শুরু করেন জাপান ও সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। চিন বিজ্ঞানীরা সিংতাই ভূমিকম্পের (১৯৬৮) পর ভূমিকম্পের পূর্বাভাস সম্বন্ধে নিরন্তর গবেষণা চালান। ভূমিকম্পের পূর্বে বিভিন্ন গৃহপলিত ও বন্য প্রাণীদের অস্বাভাবিক আচরণ নজর করে তাঁরা

এরপর 2 পাতায়

স্মরণ

নিঃশব্দে চলে গেলেন অধ্যাপক ডঃ মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

ডঃ মণীন্দ্র নারায়ন মজুমদার (৭৮) হঠাৎ ৭ই জুন সকালে কয়েকবার বমি করেন, খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন। বাকশক্তি রহিত হয়ে যায় এবং বিকাল ৩টের পর তাঁর জীবনশক্তি হারিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কল্যাণীর নিজ বাসভবনে। তিনি রেখে যান তাঁর স্ত্রী, মেয়ে ও দুই ছেলে, সবাই বিবাহিত ও কর্মে নিযুক্ত। মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সহকর্মী প্রতিবেশী ও প্রিয়জনেরা এসে ভীড় করেন (১৭ই জুন অধ্যাপক মজুমদারের সস্ত্রীক আমেরিকায় যাবার দিনক্ষণ স্থির ছিল)।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সহ (১৯৬৫) সমস্ত উচ্চ শিক্ষা শেষ করে কিছুদিন কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা

এরপর 3 পাতায়

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (১৯৩৮-২০১৫)

গত ৭ জুন ২০১৫ রবিবার, আমাদের সবার প্রিয় বন্ধু শিক্ষক মণিদা, অধ্যাপক মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার চলে গেলেন। মণিদার জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার গোপালনগর গ্রামে। দেশ ভাগ ও স্বাধীনতার পর ওঁদের পরিবার এ বাংলার হুগলির ভদ্রেশ্বরে থিতু হয়। ভদ্রেশ্বরের তেলেনিপাড়া হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক, চন্দননগর কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট করে কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে রসায়নে অনার্স নিয়ে পড়াশুনা। এম এস সি (রসায়ন) এবং পি এইচডি ডিগ্রি লাভ কলকাতা

এরপর 3 পাতায়

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস

1 পাতার পর

সফল ভাবে হেই ঢে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন এবং প্রায় লক্ষাধিক চিনা জনগণকে বাঁচিয়ে ছিলেন। এই সফল্যকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব উন্নতদেশে ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের গবেষণা চলছে।

প্লেট টেক্টনিক তত্ত্বের সাহায্যে পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে কী মাপের ভূমিকম্প হতে পারে তা এখন আগাম বলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। স্যাটেলাইট সার্ভের মতো প্রযুক্তি আসার পর প্লেটগুলির গতি পরিবর্তনের প্রকৃতিও প্রতিনিয়ত হিসাব করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, বিজ্ঞান এখন আগের তুলনায় অনেক দূর এগিয়েছে।

বিজ্ঞানীদের মতে, ভূমিকম্পের পূর্বাভাসকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়— ১) দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাস, ২) মধ্যবর্তী পর্যায়ের পূর্বাভাস এবং ৩) স্বল্প সময়সীমার পূর্বাভাস।

১) দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাস ঃ- অধিকাংশ ভূমিকম্প প্লেট সীমান্ত অঞ্চলে এবং চ্যুতিতলে হয়। সেই কারণে সারা পৃথিবীর সচল প্লেটগুলির সীমান্ত অঞ্চল এবং চ্যুতিতলগুলির সুনির্দিষ্ট চিহ্নিতকরণ করে দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস অনেক ক্ষেত্রে সফলভাবে দেওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে ১৩ বছর অন্তর চ্যুতিতলে পাতগুলি বড়ো মাপের সংঘর্ষ ঘটাতে পারে, এমন পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়।

২) মধ্যবর্তী পর্যায়ের পূর্বাভাস ঃ মধ্যবর্তী পর্যায়ের পূর্বাভাস বলতে কয়েকমাস থেকে এক বছরের মধ্যে ভূমিকম্পের আগাম সতর্কিকরণকে বোঝায়। এক্ষেত্রে যেসব অঞ্চল ভূমিকম্পপ্রবণ সেখানে গত ১০০ বা তার কিছু বেশি সময়ের ভূমিকম্প সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করা হয় এবং তার থেকে স্থানগত এবং সময়গত ক্লাসটার (Cluster) বিশ্লেষণ করা হয়। এই বিশ্লেষণ থেকে অধিক পীড়ন কেন্দ্র গুলিকে চিহ্নিত করে পূর্বাভাস দেওয়া হয়। এ জাতীয় স্বল্পমেয়াদি পূর্বাভাস জীবন ও সম্পদহানি ঠেকাতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

৩) স্বল্পকালীন সময়সীমার পূর্বাভাস ঃ কয়েক দিন থেকে ঘন্টার মধ্যে ভূমিকম্পের আগাম সতর্কবার্তাকে স্বল্পকালীন সময়সীমার পূর্বাভাস বলে। বর্তমানে সারা পৃথিবীব্যাপী এই স্বল্পকালীন পূর্বাভাসের গবেষণা চলছে। এ বিষয়ে চিন, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছু যুগান্তকারী গবেষণার ফলাফল নজরে এসেছে। যেমন —

ক) পদার্থের ধর্মের পরিবর্তন ঃ ভূমিকম্পের আগে সংলগ্ন অঞ্চলের পদার্থসমূহের ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিবর্তন হল—শিলা বা প্রস্তরখন্ডের হেলে যাওয়া, শিলার ঘনত্বের পরিবর্তন, ইলেকট্রিকাল রেজিসটিভিটির পরিবর্তন, শিলার চৌম্বকত্বের পরিবর্তন, কুয়ো বা টিউবওয়েলের জলের তাপমাত্রার পরিবর্তন ইত্যাদি। এই ধরণের পরিবর্তনগুলির নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভূমিকম্পের স্বল্পমেয়াদি পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব।

খ) ডাইলেটেনসি তত্ত্ব ঃ এই তত্ত্বের জন্মদাতা রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। তাঁরা লক্ষ করেন যে বড়ো ভূমিকম্পের কয়েক মুহূর্ত আগে P তরঙ্গের গতিবেগ S তরঙ্গের তুলনায় বেড়ে যায়। এই গতিবেগের তারতম্য মূল ভূমিকম্পের শুরুতে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। এই তত্ত্ব ডাইলেটেনসি তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই তত্ত্বের প্রয়োগে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে কালিফোর্নিয়া অঞ্চলে সফল পূর্বাভাস করা সম্ভব হয়েছিল।

গ) প্রাণীদের অস্বাভাবিক আচরণ ঃ ভূমিকম্পের অব্যবহিত পূর্বে গৃহপালিত কিংবা বন্যপশু পাখিদের আচরণের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। চিনের বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁদের মতে প্রতিটি প্রাণী সে যে পরিবেশে বসবাস করে তাঁর সূক্ষ্মতম পরিবর্তনকে সে অনুভব করতে পারে। এইসব পরিবর্তনে সে সাড়া দেয় এবং বিপজ্জনক পরিবেশ থেকে পালাবার চেষ্টা করে। এইভাবে ভূমিকম্পের আগে প্রাণীদের অস্বাভাবিক আচরণ প্রত্যক্ষ করে চিন দেশের বিজ্ঞানীরা ওদের দেশে বেশ কয়েকটি ভূমিকম্পের সফল পূর্বাভাস দিয়ে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করেছিলেন। বর্তমান চিন ছাড়িয়ে বিভিন্ন দেশে এই গবেষণা জোর কদমে চলছে। পায়রাও গবেষণা ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নিতে পারে। এদের পায়ের টিবিয়া ও ফিবুলা অংশের নার্ভগুলি ভূমিকম্পের তরঙ্গের ক্ষেত্রে খুবই সংবেদনশীল।

লেখক ঃ ডঃ চন্দন সুরভি দাস

Email : yenisi2002@gmail.com, Mob.: 9477589456

মরণোত্তর চক্ষুদান ঃ এক সামাজিক কর্তব্য

পুস্তিকা প্রকাশ ও আলোচনা সভা ঃ ২৯ আগষ্ট বিজ্ঞান দরবারের কার্য্যালয়ে (১৬, টেলর রোড) মরণোত্তর চক্ষুদান ঃ এক সামাজিক কর্তব্য শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন কাঁচরাপাড়া উদ্বোধনী মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী বিশ্বনাথ সরকার। শ্রীসরকার পুস্তিকাটি প্রকাশ করে সর্বস্তরের মানুষকে চক্ষুদানের বিষয়ে অঙ্গীকার করার আহ্বান জানান। সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রীরামপুর সেবা কেন্দ্র ও চক্ষু ব্যাঙ্কের কর্মী সীতাংশু কুমার ভাদুড়ী। ২০০৯ থেকে ২০১৪ টানা ৬ বছর শ্রীরামপুর সেবা কেন্দ্র সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মরণোত্তর কর্ণিয়া সংগ্রহ করেছে। ২০১৩ ও ১৪ সালে যথাক্রমে ৪২৮ ও ৪১৯। পশ্চিমবঙ্গ কর্ণিয়া সংগ্রহে অনেক পিছিয়ে আছে কারণ রাজ্যে সরকারী ভাবে মাত্র ২টি চক্ষুব্যাঙ্ক। উত্তরবঙ্গের মেডিক্যাল কলেজের আই ব্যাঙ্ক বন্ধ, কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ ও নীলরতন মেডিক্যাল কলেজে মাত্র ১টি করে আই ব্যাঙ্ক আছে। বাকী ১০/১২টি বেসরকারী ভাবে চক্ষু সংগ্রহ করে। অথচ গুজরাত, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্র সরকারী ভাবে চক্ষু ব্যাঙ্কের সংখ্যা যথাক্রমে ১৯, ২২ ও ৩৯। বক্তা শ্রীভাদুড়ী মরণোত্তর চক্ষু দান বিষয়ে জানান সারা বিশ্বের মধ্যে একমাত্র শ্রীলঙ্কা কর্ণিয়া রপ্তানি করে। প্রতি বছর ৭ ডিসেম্বর কর্ণিয়া দিবস পালন করা হয়।

সভায় বিজ্ঞান দরবারের পক্ষে অজন্তা রায় জানান আগামী দিনে কল্যাণী মেডিক্যাল কলেজে আই ব্যাঙ্ক চালু করার দাবী জানিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। সম্পাদক সুরজিত দাস জানান বিজ্ঞান দরবারের পক্ষ থেকে কর্ণিয়া সংগ্রহ করে সরকারী কলেজে দেওয়া হবে।

স্মরণ ঃ ডঃ মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

1 পাতার পর

করে ১৯৬৬ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর গবেষণা ও অধ্যাপনার সময় তিনি বিভাগীয় প্রধান, বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির ডীন, হিসেবেও কাজ করেছেন। অন্তত তিনজন তাঁর অধীনে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর জন্ম ও শৈশব বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার বেড়াল নদীর ধারে গোপালনগর গ্রামে। বাংলা ভাগের পর এপারে এসে প্রথমে কান্তিপুরে ও পরে ভদ্রেশ্বরে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আই এস সি ও রসায়ন বিদ্যা নিয়ে বিএসসি, অজৈব রসায়নে এমএসসি পাস (১৯৬০) করেন। সম্পন্ন ঘরে জন্ম হলেও ছাত্র জীবন কেটেছে তাঁর দারিদ্রের মধ্যে।

বরাবর তিনি ছাত্র রাজনীতি ও হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে থাকলেও ৭০ দশকের রাজনীতির এলোমেলো হাওয়া এবং অসংখ্য ছাত্র যুবকের আত্মত্যাগ, বরাহনগরের গণহত্যা তাঁকে অশান্ত করে তোলে। তিনি ছিলেন অতিকায় সংবেদনশীল ও আবেগপ্রবণ ছাত্র দরদি গরীব ছাত্র সহায়ক শিক্ষক। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কল্যাণী ছিল আবাসিক উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র। রাজনীতির গরম হাওয়ায় এ সময় একদিকে প্রতি শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে ছাত্রছাত্রীরা নিত্য যাতায়াত করে পড়াশোনার সুযোগ পায়। ডঃ মজুমদার এই সময় খুব সহজেই হয়ে গেলেন স্নাতকোত্তর অনেক ছাত্র-ছাত্রীর শ্রদ্ধেয় মণিদা। আমৃত্যু সেই ধারাই তাঁর বজায় ছিল। তাঁর সহজ, সরল জীবনযাত্রা, বন্ধু বাৎসল্য এবং আতিথিয়তা কাছের ও দূরের বহু অসম বয়সের সমাজ-ভাবনার যুবা, মধ্যবয়সী ও প্রবীনদের চুম্বকের মত আকৃষ্ট করত। তাঁর নিজের বিষয়ের বাইরের তথ্য ও তত্ত্ব জানাশোনার অসীম আগ্রহ থেকেই তিনি যুক্ত হয়েছিলেন কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ চত্বরে বন্ধুদের সঙ্গে সায়েন্টিফিক ওয়ার্কারস ফোরামে, পরে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী পত্রিকার সঙ্গে।

জরুরী অবস্থার অবসানের পর তিনি ও তাঁর ছাত্র প্রতিবেদক কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে অনুসন্ধানমূলক খবর ও বিজ্ঞানের বিষয়কে জনপ্রিয় করবার প্রয়াসে প্রতিষ্ঠা করেন পাক্ষিক বাংলা পত্রিকা প্রগতিবার্তা (১৯৭৭)। এই পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার উপরের বাক্যাংশ বা শ্লোগানটি 'জনবিজ্ঞান ও জনজীবন বিষয়ক' তাঁর দেওয়া। সাধারণের জীবনে নিত্যদিনের কাজকর্মে বিজ্ঞানের অবদানকে কাজে লাবাগাবর জন্য বিজ্ঞানের অংশবিশেষকে সমাজ সুখী করা এবং বৃহত্তর সমাজকে বিজ্ঞান সচেতন করবার উদ্দেশ্যেই প্রগতি বার্তার চলা শুরু, এখনো চলছে। মণিবাবু প্রায় দুদশক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকা ছাড়াও উৎস মানুষ, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, ইংরাজী ফ্রন্টিয়ার, বাংলা ও ইংরাজী স্টেটসম্যান পত্রিকাসহ বহু জায়গায় তিনি নিয়মিত তাঁর ভাবনার কথা লিখতেন। তাঁর নেতৃত্বেই সমীক্ষা করা হয়েছে ইট ভাটা ও বালিখাদের চাষের জমি ও কৃষকদের ক্ষতির কথা, পরিবেশ দূষণের নানাদিক এবং ইটভাটার ভিনরাজ্যের শ্রমিকদের লাগামছাড়া শোষণ ও বঞ্চনার কাহিনী। সমীক্ষা করা হয়েছে কল্যাণী, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, কুন্তীঘাটের শিল্পাঞ্চল ও তার দূষণ বিস্তার। এসব কাজের ফলস্বরূপ তিনি খুব যত্ন সহকারে প্রামাণ্য কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। যথা পরিবেশ বিদ্যা পরিচয় (২০০২), বাংলায় আর্সেনিক (দ্বিতীয় সংস্করণ সহ) ফ্লুরাইড বিষণ, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যে আর্সেনিক ফ্লুরাইড (ন্যাশনাল বুকট্রাস্ট, ২০১৪)। শুধু বাংলা কেন, ইংরাজীতেও এই ধরণের বই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য পাওয়া দুষ্কর। তিনি ছিলেন অসাধারণ মনোযোগী পাঠক, প্রখর শক্তিধর ও অসম্ভব পরিশ্রমী। তাঁর জীবনযাত্রা ঘরে, বাইরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল অতিসাধারণ ও সরল।

অবসর গ্রহণের পর তাঁর ঝোক ছিল সমাজবিদ্যা, সমাজ জীবন ও সমাজের সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা বিষয়ে জানাবোঝা ও জনসমক্ষে তুলে ধরার দিকে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের কৃষি জমি বঞ্চনার আন্দোলনের প্রতি তিনি ছিলেন সংবেদনশীল; ভাল চাষের জমিতে কারখানা ও রাসায়নিক শিল্পের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী প্রচার আন্দোলনে তিনি ছিলেন দৃঢ় সেনাপতি। সম্প্রতি কালে তাঁর চর্চার বিষয় ছিল-বায়োকেমিক্যাল সিগন্যালিং। অর্থাৎ কী করে পিঁপড়েরা এক লাইনে চলে, ব্যঙ ও পাখিরা কি করে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ করে তা নিয়ে গভীরভাবে অধ্যায়ন করা ও প্রবন্ধ রচনা করা, বিতর্ক সৃষ্টি করা। চাষের জমির বিষ ও শিল্প কারখানা দূষণ আমাদের খাদ্য-পানীয়ের শৃঙ্খলে ঢুকে পরিপাক ক্রিয়াকে কিভাবে বিপর্যস্ত করে তা নিয়ে লেখালেখি করেছেন। হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সোস্যাল সায়েন্স কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণের ভিত্তিতে রচিত দিগদর্শী ' লো লেভেল কেমিক্যাল পলিউশন, এনডো ক্রোয়িন ডিসরাপশন অ্যান্ড দ্য ইমপেরিল্ড বায়োস্ফিয়ার' (Low-level chemical polution, endocrine disruption and the impeerilled Bio-sphere - 2010) নামক পুস্তিকার জন্য তিনি ডঃ এ কে হ্যারিয়েন স্বর্ণপদক লাভ করেন।

জনকল্যাণ সুখী ট্রাস্ট ফাউন্ডেশন ফর হেলথ অ্যাকশন বাঁকুড়ার কুলবেড়িয়া গ্রাম 'আমাদের হাসপাতাল' নামে যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছে এবং বিগত ছ'বছর ধরে চলছে তার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ট্রাস্টের সভাপতি ছিলেন প্রায় বছর খানেক। নাগরিক মঞ্চের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির ও বিজ্ঞান কাবের কর্মসূচী এবং আন্দোলনে একনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকতেন। এইসব সংগঠনের বন্ধু দের তাঁর বাড়ি ছিল অবারিত দ্বার, আড্ডার কেন্দ্রস্থল। জনপ্রিয় একটি রসায়ন পরীক্ষাগার তৈরির জন্য তিনি দুদশক ধরে পরিকল্পনা, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে অবশেষে গত বছর তার গৃহ সংলগ্ন জমিতে দুটি ঘর নির্মাণ করে বহু অর্থ ব্যয় করেছেন এবং আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নামে একটি গবেষণাগার তৈরি করেছেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গেলো হয়ত। একটি কমিটিও তৈরি করেছিলেন বন্ধুদের নিয়ে। পরীক্ষাগারে প্রচলিত বিজ্ঞানের কাজকর্মের সঙ্গে ভেজাল পরীক্ষা, আর্সেনিক, ফ্লোরাইড ও অন্যান্য দূষণকারী পদার্থ পরিমাপ করা। তাঁর এই অকাল আকস্মিক প্রয়ানে ছাত্ররা হারাল দরদী ও নিষ্ঠাবান একজন রসায়নবিদ শিক্ষককে, সমাজ ও বিজ্ঞানকর্মী বন্ধুরা তাঁদের একজন সহযোদ্ধা ও সাহায্যকারী সহৃদয় মানুষকে। এক কথায় তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ সাধারণ মানুষ।

— লেখক ঃ- ডঃ অমূল্য মন্ডল, সম্পাদক, প্রগতিবার্তা, কল্যাণী।
ফোন ঃ- ৯৪৩৩৯৫৭৬৭১

বেঙ্গল ফ্লোরিকান

1 পাতার পর

কালচে ধূসর রেখা ছাড়া সারা শরীরটি শুধুই এক রঙা হলদেটে ধূসর রঙের। 'বাস্টার্ড' জাতীয় সব পাখিদের মতো এদেরও পা দুটি লম্বা, সুগঠিত ও পেশীবহুল। কিন্তু একমাত্র এই জাতীয় বাস্টার্ডদের ক্ষেত্রেই স্ত্রী পাখিরা পুরুষদের তুলনায় বড় ও ভারী হয়। উচ্চতা প্রায় ৬০ সেমি।

পলিগঠিত আর্দ্র, বিস্তৃত ও স্বল্প উচ্চতা বিশিষ্ট তৃণভূমি এদের আদর্শ বাসস্থান। সাধারণত এই স্বল্প উচ্চতাবিশিষ্ট তৃণভূমিকে ঘিরে থাকে ১-২ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট দীর্ঘ তৃণভূমি। স্ত্রী পাখিদের গতিবিধি মূলতঃ লম্বা ঘাসের জঙ্গলেই সীমাবদ্ধ থাকে। আবার মধ্য দিনে সূর্যের প্রখর তাপ এড়াতে লম্বা ঘাসের জঙ্গলই স্ত্রী-পুরুষ সকল পাখিকেই আশ্রয় প্রদান করে। এই তৃণভূমির মধ্য বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝোপঝাড় ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদেরও দেখা মেলে। আখের জঙ্গল এদের সর্বাধিক পছন্দের জায়গা। কারণ শুধু আশ্রয় প্রদানই নয় আখের রস যথার্থ পুষ্টি প্রদানকারীও বটে।

খাদ্যবস্তুর সহজলভ্যতার উপর নির্ভর করে এদের খাদ্যাভাসও পরিবর্তিত হয়। তাই এদের খাদ্য তালিকায় যেমন ফল, ফলের বীজ, খাদ্যশস্য ইত্যাদি রয়েছে তেমন পিঁপড়ে, ফড়িং, টিকটিকি, ব্যাঙ এমনকি ছোটো সাপও রয়েছে।

এদের প্রজননকাল ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই মাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময় পরিণত ও সক্ষম পুরুষ নিজের এলাকা চিহ্নিত করে এবং এই এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে চলে দুই বা ততোধিক পুরুষ পাখির লড়াই। স্ত্রী পাখিকে আকর্ষণ করার জন্য এই সময় পুরুষরা একটি অনবদ্য 'Courtship display' করে থাকে যার খ্যাতি বিশ্বজোড়া।

প্রজননঋতুতে কিন্তু এরা সঠিকার্থে কোনো বাসা তৈরী করে না। স্ত্রী পাখি ঘন ঘাসের মধ্যে মাটি সামান্য খুঁড়ে একটি বা দুটি ডিম পাড়ে। জলপাইরঙা ডিমগুলি ফুটে প্রায় ২৬-২৮ দিন বাদে শাবক বের হয়। সন্তানপালনে বাবার কোনো ভূমিকাই কিন্তু থাকে না। সকল দায়িত্বই বর্তায় মা-এর উপর।

এমন বৈচিত্রপূর্ণ এই বেঙ্গল ফ্লোরিকান পাখির অস্তিত্ব কিন্তু এখন প্রায় প্রশ্নচিহ্নের মুখে IUCN (International Union for the Conservation of Nature) এর লাল তালিকায় এটি ইতিমধ্যেই 'Critically endangered' হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। ভারতবর্ষেও Indian wildlife act এর Schedulei - I এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এদের।

একদা ভারতীয় উপমহাদেশে উত্তরপ্রদেশের তরাই থেকে বিহার, নেপালের তরাই, পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স হয়ে আসাম, অরুনাচলপ্রদেশের সমতলভূমি ও বাংলাদেশেও অস্তিত্ব ছিল এদের।

বর্তমানে ভারতবর্ষে উত্তরপ্রদেশের দুধওয়া ব্যাঘ্র প্রকল্প, কিষাণপুর অভয়ারণ্য, উত্তর পিলভিট ব্যাঘ্র প্রকল্প, অসমের মানস, কাজিরাঙ্গা, 'ডিব্রু-সইখোয়া', 'ওরাং' জাতীয় উদ্যান; অরুনাচলপ্রদেশের 'ডি' এরিং মেমোরিয়াল অভয়ারণ্য, দিবাং জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে পাখিটির অস্তিত্ব বজায় রয়েছে।

নেপালের সুক্লা ফাটা অভয়ারণ্য 'চিতওয়ান জাতীয় উদ্যান'-এও রয়েছে মুষ্টিমেয় কিছু বেঙ্গল ফ্লোরিকান। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কম্বোডিয়াতেও এর অপর একটি Subspecies এর সন্ধান মেলে।

দ্রুতহারে বেঙ্গল ফ্লোরিকানের এই বংশনাশের মূল কারণ তাদের বসতি গড়ার উপযোগী তৃণভূমির নির্বিচারে ধ্বংসসাধন। কখনো এই তৃণভূমির রূপান্তরকরণ হয়েছে চাষের জমিতে, কখনো গবাদিপশুর চারণভূমি রূপে অতিব্যবহৃত হয়েছে আবার কখনো বা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ভাবে পোড়ানো হয়েছে তৃণভূমি। এছাড়াও অতিমাত্রায় শিকার ও ডিম চুরিও ক্রমশঃ অস্তিত্ব সংকটের মুখে এনে ফেলেছে এই পাখিটিকে।

লেখক ঃ স্বাগতা সরকার। Mob.: 8900410545

Email ঃ samratswagata11@gmail.com

প্রতিদিন অঙ্কুরিত ছোলা খান সুস্থ থাকুন

প্রতিদিনের প্রাতঃরাশে বা অন্য কোন সময় ৩-৪ টেবিল চামচ অঙ্কুরিত ছোলা বা মটর বা ঐ জাতীয় বীজ রাখুন তাহলে শরীর তার প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ফাইবার ভিটামিন সি, ক্যারোটিন ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ধাতব লবন সহজে পেয়ে যাবেন। যা সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে। ভিটামিন সি, ই, এ -এর সঙ্গে গ্লাইকো সাইলেটস অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের জোগান দেয় যা দেহকে সুস্থ রাখে। অঙ্কুরোদগমের ফলে বীজ সহজ পাচ্য হয়। প্রায় ৫০০০ বছর আগে চীনা চিকিৎসকরা রোগীকে অঙ্কুরিত বীজ খাওয়ার পরামর্শ দিতেন। আমাদের দেশেও এক সময় প্রতিদিন এটি খাবার চল ছিল এটির উপকারিতা ভেবে।

লেখক ঃ ডঃ ইরা ঘোষ।

পরিবেশ প্রদর্শনী, সেমিনার ও প্রতিযোগিতা

২ আগষ্ট হালিশহর রবীন্দ্র বিদ্যামন্দির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হল ঘরে হালিশহর 'বেরিয়ে পড়ি' ও কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের ব্যবস্থাপনায় এক পরিবেশ প্রদর্শনী, সেমিনার ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পরিবেশ বিষয়ে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপিঠ হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র অভিষেক দত্ত প্রতিযোগিতায় সেরা পুরস্কার পায়। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণীর বিভিন্ন তথ্য সহ পরিবেশবিদ শুভদীপ চৌধুরী সুন্দরবনের জীব জগৎ ও বন্য প্রাণীদের ছবি দেখিয়ে সুন্দরবনের সমস্যাগুলি আলোকপাত করেন। বসন্ত বৌরি পাখির বাচ্চা প্রতিপালন নিয়ে গবেষণাধর্মী বক্তব্য রাখেন আলোকচিত্র সহ বিশিষ্ট পাখী বিশারদ সম্রাট সরকার। বসন্ত বৌরি পাখির বাচ্চা প্রতিপালন নিয়ে ধারাবাহিক পর্বের ছবি দেখিয়ে বর্ণনা করেন। হিমালয়ের উপর বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন আলোকচিত্র সহযোগে বক্তব্য রাখেন পরিবেশবিদ দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সম্পাদক প্রবীর বসু ও জয়দেব দে। প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সহ সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিজ্ঞান দরবারের সম্পাদক সুরজিত দাস। বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রপত্রিকা ও পোস্টার প্রদর্শনী করা হয়েছিল। বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

কুসংস্কার

কুসংস্কার হল যুক্তিবিহীন অবৈজ্ঞানিক প্রথা যা আমরা অন্ধ ভাবে অনুসরণ করি। মা ঠাকুমা, দিদিমা মাসিমার আমল থেকে নেমে আসা আমরা বাঙ্গালীরা শুধু বাঙ্গালীই বা বলি কেন সারা ভারতবাসীরাই কুসংস্কারছন্ন। আমরা যতই বিজ্ঞানমনস্ক হই না কেন, প্রদীপের আলো ছেড়ে নিয়ন বাতি জ্বালাই না কেন, মনের অন্ধকারে কুসংস্কার কুশাসন পেতে গেড়ে বসে আছে তাদের কোন ভাবেই হটাতে পারা যায় না। কুসংস্কারের হাত থেকে বড় বড় ভিআইপিরা ছাড় পান না। কবি নজরুল ইসলাম তীব্র ব্যঙ্গ করে লিখেছেন 'মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি। টিকি দাড়ি নিয়ে আজও বেঁচে আছি'। বাস্তবিক হাঁচি হোঁচট বেড়াল শেয়ালের ডাক যাত্রায় অশুভ। বারবেলা, অশ্লেষা, মঘা এ্যহস্পর্শে যাত্রা নাস্তি। তিলতত্ত্বে তিলের অবস্থান নিয়েই বা কত কথা! গলায় তিলে সুকণ্ঠী হাতে তিলে দাতা, পেটে তিলে পেটুক, পায়ে তিলে ভ্রমণ, এমন কত আছে। বা বাবুই পাখী বাসা অমঙ্গল, একতারা দেখতে নেই, এক চোখ দেখাতে নেই, এক কাঁধে হাত রাখতে নেই মা মারা যায়। চৌকাঠে বসতে নেই। ছাই দেখা, খালি কলসী দেখা, রজক দেখা, বাঁ দিক দিয়ে শব যাত্রা দেখা খারাপ। রবি গুরু মঙ্গলের ঊষা/আর সব ফাসা ফাসা। রবি গুরু অর্থাৎ বৃহস্পতি এবং মঙ্গলের ঊষাকালে যাত্রা করলে আর দিন প্রয়োজন নেই। কোন পৌরানিককালে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অগস্ত্য বিন্ধ পর্বত অবনত অবস্থায় রেখে যাত্রা করেছিলেন ১লা ভাদ্র। ফেরেনি। তাই ঐদিনটি শুভযাত্রার পক্ষেনিষিদ্ধ হয়ে গেল। এইসব ব্যাপার খনাদেবী অনেক রকম বচন দিয়ে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন যাতে খানায় না পড়ি। শস্য ও চাষের ব্যপারে, পরমায়ু গণনায়। মৃত্যুলগ্নের শুভাশুভ তিনি তাঁর গণনার দ্বারা নিরূপন করে গেছেন। ছুঁয়ে দিলে নাকি জাত যায়। বালক নরেন নিচু জাতের হুঁকো টেনে পরখ করেছিলেন কেমন করে জাত যায়। জাতিভেদ প্রথার কুসংস্কার যা ধর্মপূজারি নজরুলকে গভীর পীড়া দিয়ে ছিল। তাই তিনি গেয়েছেন ঐ জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া/ছুলেই তোর জাত যাবে?' ছেলের হাতের নয়কো মোয়া ইত্যাদি। আদিম মানুষের কাছে সব কিছুই ছিল অসীম রহস্যে ভরা। তার ব্যাখার অগোচরে। প্রকৃতির সর্বত্রই তারা অনুভব করত বিচিত্র অলৌকিক শক্তি। সেই কল্পিত শক্তিকে সন্তুষ্টি করার পূজা করত। ক্রমে এইভাবে দেবতা, উপদেবতা অপ দেবতা ভূতপ্রেত তাগা তাবিজের বিশ্বাস জন্মেছে।

আদিম সমাজ বৃষ্টির অভাবে নরবলি দিয়ে সেই বক্ত জমিতে ছড়িয়ে দিত। প্রকৃতির রোষ নিবারণের জন্য রবীন্দ্রনাথ দেবতার গ্রাস কবিতায় বালক রাখালকে নদী বক্ষে বিসর্জ্জনের মধ্যে দিয়ে কুসংস্কারের নির্মমরূপটি প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। রক্ষণশীল আচার আচরণ সমর্থনে টিকি পৈতার সংরক্ষণ দরকার মনে করা হয়, তেমনই তীর্থ অনুসারে আহার্য গ্রহণের সংস্কার আছে। পাঁজি পুথির কচকচি অনুসারে নবমীতে লাউ খেতে নেই, ত্রয়োদশীতে বেগুন খেতে নেই, বুধবার পোড়া খেতে নেই, দ্বিতীয়াতে পটল খেতে নেই, অষ্টমীতে বেল খেতে নেই, এরপর আছে অপঘাতে মৃত্যুতে ভূত হওয়া কিংবা বাটি চালা, চালপড়া খাওয়া নখদর্পণের সাহায্যে হারান বস্তুর প্রাপ্তি। এত গেল আমাদের দেশের এবার উন্নত দেশের কিছু কুসংস্কারের কথায় আসি। সেখানেও আমাদের চাইতে কিছু কম কুসংস্কার নেই। পাশ্চাত্য দেশে কালো বেড়াল বা তেরো সংখ্যাটি অমংগল বা দুর্ভাগ্যের চিহ্ন। আয়না ভাঙ্গা দুর্ঘটনার, হাত থেকে হঠাৎ ছুরি যদি মাটিতে পড়ে যায় তখন কেউ বাড়ীতে আসছেন। আমাদের মাটিতে বাসন পড়ার মত। মাটিতে পিন কুড়িয়ে পাওয়া শুভ লক্ষণ। এ বিষয়ে ইংরেজী ছড়া আছে;

See a pin and pick it up
All day long you'll have good luck
See a pin and let it lay
You will have bad luck all day

আমাদের মত বিলেতেও বার নিয়ে ভাবনা চিন্তা আছে, কারণ

Monday for wealth / Tuesday for Heatth
Wednesday the best day of all / Thursday for Crosses
Friday for losses / Saturday no luck at all.

Sunday বা রবিবারের কথা ছড়াটিতে না থাকলেও আমাদের মত বা অনেকের মতেই Sunday অতি শুভ দিন। ঘোড়ার খুড়ের পেরেকও সৌভাগ্যের লক্ষণ।

আমাদের মত বিদেশেও হাঁচি, কাশি, পেছনে ডাকা, পোকামাকড়, বেড়াল, গরু, প্রাণী পতঙ্গ নিয়ে অজস্র সহস্র কুসংস্কার আছে। কুসংস্কার বশেই জোয়ান অব আর্ক কে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। স্বদেশে বিদেশে এখনও রয়েছে কুসংস্কারের প্রচলন। তাই আজও সতীদাহ প্রথা, ডাইনী হত্যা নরবলির মত নিষ্ঠুরতম কাজ ঘটে যেতে দেখা যায়। মার্জিত বুদ্ধি বিবেচনা ও যাচাই সহকারে সত্যের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে কুসংস্কারের অপনয়ন আজ বিশেষ প্রয়োজন।

লেখক ঃ ডঃ সতী চক্রবর্ত্তী। মোঃ- ৯৮৩০৭৪৪৩৪০

জীবনযাত্রা ও পরিবেশ

বিজ্ঞান দরবারের কার্যালয়ে (১৬ টেলর রোড, কাঁচরাপাড়া) ১১ জুলাই জীবনযাত্রা ও পরিবেশ শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বক্তা ছিলেন পরিবেশ গবেষক কল্লোল রায়। শ্রীরায় আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় পরিবেশ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল ও কয়লা সম্ভাব্য শেষ হবার সালগুলি ২০৬০, ২০৯০ ও ৩০০০। সম্পদশালী দেশের লোকেরা শক্তির অপব্যবহার করে বাতাসকে দূষিত করে তুলেছে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশের ছবি দেখিয়ে বক্তা বলেন পৃথিবীর তাপমাত্রা বর্তমানে ০.৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট বৃদ্ধি পেয়েছে যদি ১.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পায় তবে ২৫-৩০টি দেশ জলের তলায় চলে যাবে। উন্নত ১২টি দেশ ৭৬ ভাগ কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করছে। বাকি ১৮১টি দেশ মাত্র ২৪ ভাগ Co_2 নির্গত করছে। শ্রীকল্লোল রায় জানান আর্কটিক গলছে, যদি পশ্চিম আন্টার্কটিকার বরফের চাদর গলে যায় তাহলে সমুদ্রের জলস্তর ১৬ ফুট বৃদ্ধি পাবে। বক্তা বিকল্প হিসাবে Refuse, Repair, Recover, Reconsider এর কথা ব্যাখা সহ বলেন। বিশ্ব উষ্ণায়ন কমানোর জন্য সর্বস্তরে গাছ বেশি করে লাগানো দরকার। বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচনা সভা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

1 পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৬৬-তে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসেবে যোগদান।

দীর্ঘ ৩৮ বছরের শিক্ষকতা, সঙ্গে নানা দায়িত্ব পালন বিভাগীয় প্রধান, সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন, স্টাডি বোর্ডের চেয়ারম্যান ইত্যাদি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রাখেন। ছাত্রছাত্রীদের মুস্কিল আসান।

কিন্তু শুধু অধ্যাপনা কাজে আবদ্ধ থাকলে মণিদাকে আমরা চিনতামই না হয়তো। তিনি প্রতিবাদী, আপোষহীন সংগ্রামী, বিকল্প সন্ধানী। সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের মেলবন্ধনের সূত্র খুঁজেছেন আজীবন। আর তাই ক্রমে নানাক্ষেত্রের অনুসন্ধান, লেখালেখি, মিছিলে হাঁটাহাঁটি, কাজে নেমে পড়া। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গে আরও বিস্তৃত হলো তা। পরিবেশ, মানবাধিকার, রাসায়নিক দূষণ, পরমাণু প্রযুক্তি বিরোধ, ভূপাল বিষ গ্যাস কান্ডের বিষয়ে সরব থেকেছেন সর্বদা। এইসব নিয়ে লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। অর্চনা গুহ মামলর পাশে থেকেছেন। বালি খাদান ও ইটভাটা এলাকায় ঘুরে ঘুরে যেমন শ্রমিকদের দুর্দশা দেখেছেন, তাদের কথা লিখেছেন, তার সাথে কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট উর্বর মৃত্তিকা স্তর ধবংসের বিষয়ে আমাদের সজাগ করেছেন। পানীয় জলে আর্সেনিক ও ক্লোরাইড দূষণে মানুষের রোগভোগ নিজের চোখে দেখতে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের জেলায় জেলায় ঘুরেছেন এবং তা নিয়ে যেমন লিখেছেন, বলেছেন, কাজ করেছেন, তেমনি শেষ বয়সে এতদিনের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা ঢেলে রচনা করেছেন কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক। উত্তরসূরী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষেরা হয়তো এগুলি থেকে পরিবেশ সুরক্ষিত রেখে বাঁচার হদিস পাবেন। বাংলায় আর্সেনিক ঃ প্রকৃতি ও পরিচয়, ফ্লোরাইড দূষণ ঃ একটি স্বাস্থ্য-ভূতাত্ত্বিক আলোচনা (পুস্তিকা); লো-লেভেল কেমিক্যাল পলিউশন, এনডোক্রোইন ডিসরাপশন অ্যান্ড দ্য ইমপেরিল্ড বায়োস্ফিয়ার (ইংরেজি পুস্তিকা) এবং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড—বইগুলি তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। শেষোক্ত বইটির প্রকাশক ন্যশনাল বুক ট্রাস্ট প্রকাশনা-র দিল্লির আধিকারিক তাঁকে জানিয়েছেন যে — 'এমন বই আমি জীবনে প্রথম পড়লাম, প্রথম প্রকাশ করলাম'। বইটি অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশের উদ্যোগ নেবেন বলেও বলেছিলেন।

প্রিয় ছাত্র ড. অমূল্য মন্ডলের সাথে পত্তন করেছিলেন নতুন ধরণের স্থানীয় সংবাদ পাক্ষিক — প্রগতিবার্তা। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, উৎস মানুষ, ফ্রন্টিয়ারে, নিয়মিত লিখতেন। আরও বহু পত্রিকা ও সংবাদপত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাঁর মূল্যবান লেখাগুলি।

এলাহাবাদের পিপলস কাউন্সিল অফ এডুকেশনের বৃহৎ শিক্ষা-কর্মকান্ডে যুক্ত হয়েছিলেন, যুক্ত হয়েছিলেন বাঁকুড়ার গ্রামের ব্যতিক্রমী 'আমাদের হাসপাতালের' সঙ্গেও। এছাড়াও বহু কর্মোদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি পেয়েছেন তাঁর নৈতিক সঙ্গ, আর্থিক সহায়তা। ' লো লেভেল কেমিক্যাল পলিউশন' শীর্ষক বক্তৃতার জন্য তিনি A.K.Phuriun স্বর্ণপদক পান, এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সোস্যাল সায়েন্স থেকে।

রসায়নবিদ্যার পঠন-পাঠন উন্নত করার ব্যাপারে তাঁর অনেক ভাবনা চিন্তা ছিল। সেগুলি কার্যকর করতে ওপরতলার লোকজনের সাথে বহু চিঠিপত্র চালাচালি করেছিলেন। কাজের কাজ কিছু হয়নি। অবশেষে দৃষ্টান্ত গড়তে শেষ জীবন বাড়িতেই গড়ে তুলেছিলেন তাঁর এক স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড সোসাইটি'। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর সেই স্বপ্নের অকালমৃত্যু ঘটবে, নাকি বহুর মধ্যে স্বপ্ন সঞ্চারিত হয়ে ডাল-পালা পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হবে—ভবিষ্যতেই নিহিত সে প্রশ্নের উত্তর।

মণিদার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক সমবেদনা।

আহ্বায়ক ঃ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী-র বন্ধুরা

৪ জুলাই, ২০১৫

মেঘনাদ সাহা অডিটোরিয়াম, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ, কলকাতা।

বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশিত

বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টচার্য বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার পুস্তিকা ২০১৫

মরণোত্তর চক্ষুদান ঃ এক সামাজিক কর্তব্য

পড়ুন ও সংগ্রহ করুন।

মূল্য ঃ ২টাকা

হিরোসিমা দিবস পালন

বিজ্ঞান দরবার ও চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে ৬ আগষ্ট সারাদিন ব্যাপি হিরোসিমা দিবস পালন করা হয়। শুরুতে সকাল ৯-৩০ মিনিটে কাঁচরাপাড়া স্টেশনে ''পরমানু চুল্লি না, বিকল্প শক্তি চাই'' শীর্ষক পোস্টার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে বিজ্ঞান দরবারের সম্পাদক সুরজিৎ দাস বলেন পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশই পরমাণু শিল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। রাশিয়ার চেরনোবিলে এখনও পর্যন্ত ১০ লক্ষের বেশি মানুষ মারা গিয়েছে। তেজস্ক্রিয়তার শিকার হিরোসিমা নাগাসাকি থেকে চেরনোবিল এর লক্ষলক্ষ মানুষ। পথসভায় বিজ্ঞান কর্মী জয়দেব দে বলেন সারা দেশে বিকল্প শক্তির উৎসগুলিকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে বিশ্ব উষ্ণায়ন তথা পরিবেশ দূষণ কমবে। বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করে সহ সম্পাদক কিঞ্জল বিশ্বাস বলেন, সোলার এনার্জি থেকে প্রায় ৬ লাখ মেগাওয়াট, বায়ু থেকে ৫০ হাজার, সমুদ্রের ঢেউ থেকে ৩০ হাজার মেগাওয়াট এবং জলবিদ্যুৎ থেকে ১ লাখ মেগওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

হিরোসিমা দিবসে কল্যাণী, মদনপুর, চাকদহ ও রানাঘাট স্টেশনে পোস্টার প্রদর্শনী ও প্রচার সভা করা হয়।মদনপুর স্টেশনের পথ সভায় বিবর্তন ভট্টাচার্য বলেন পরমাণু চুল্লি থেকে কোন বিদ্যুৎ আদৌ পাওয়া যায় না অথচ তেজস্ক্রিয়তার বিষ ছড়ায়। সারা দিন ধরে পথসভার লিফলেট, বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা, বিজ্ঞানের বই প্রচার করা হয়। চাকদহ ও রানাঘাট স্টেশনের প্রচারসভায় পথচলতি মানুষ খুবই আগ্রহের সঙ্গে পরমাণু চুল্লির বিপদ ও বিকল্প শক্তির উৎস পোস্টার প্রদর্শনীগুলি দেখেন। কলকাতার চেতনা সংস্থার কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

ফ্লোরাইড-অজ্ঞতা ও ফ্লোরোসিসের বাস্তবতা

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদেহে, বিশেষ করে মেরুদন্ডী প্রাণীসমূহের দেহে, ফ্লোরাইড কী ক্ষতি করতে পারে তা আমাদের রসায়নের পঠন-পাঠনের বইগুলিতে কোথাও নাই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ্যতেও বিষয়টি গুরুত্বহীন। কারণ হচ্ছে যে ফ্লোরোসিস হল গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষের রোগ এবং আমাদের সিলেবাস তৈরি হয় ইংল্যান্ড আমেরিকার বইগুলির ভিত্তিতে। আর ওই সব দেশে ফ্লোরোসিস, আর্সেনিকোসিসের প্রাথমিক আবিষ্কার ও গবেষণাদি হলেও সেখানে আজ ওই সব রোগ নিয়ন্ত্রিত, সেগুলির সমস্যাসমূহ অনেকটাই সমাধিত। আমি প্রায় অর্থ শতাব্দী ফ্লোরিন, ফ্লোরাইড প্রভৃতি সম্পর্কে অধ্যয়ন, গবেষণাদি করেও পাঁচ বছর আগেও জানতাম না যে ফ্লোরাইড মানুষ ও প্রাণীদেহে এত সব ভয়ংকর বিপর্যয় ঘটায়। সন্দেহ নেই যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন ও শারীরবিদ্যার (এমনকি ডাক্তারদের বেশির ভাগেরও) একই দশা।

আমার প্রথম শিক্ষা শুরু ২০০৬ সালের ১লা জুলাই, বীরভূমের নলহাটির নিকটবর্তী নসিপুর গ্রামের 'বাবলু মাস্টার' এর হাতে। শান্তিনিকেতনে এক বন্ধুর বাড়িতেও বেড়াতে গিয়ে ফ্লোরোসিস আক্রান্ত গ্রামের সংবাদ শুনে কৌতুহলবশত নসিপুর গিয়েছিলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও খড়্গপুর আই আই টি-র প্রাক্তন অধ্যাপক বিশিষ্ট জৈব রসায়নবিদ ধনঞ্জয় নসিপুরি ওই গ্রামের। তাঁর পদবি/উপাধির মধ্যেই গ্রামের নাম রয়ে গেছে। নিষ্প্রাণ গ্রামটিতে গিয়েই দেখলাম ৮/১০ বছরের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা ফ্লোরাইড কথাটির সাথে সুপরিচিত। আমার আগমন ও অনুসন্ধানের কারণ শুনে তারা হি হি করে হাসতে হাসতে বলল ''বাবলু মাস্টারের'' কাছে যাও। তখনই দেখেছিলাম ছেলেমেয়েদের দাঁত হলদেটে, লাল, বাদামি, কালচে। এ রকম বিচিত্রিত (Mottled Teeth) যে ফ্লোরাইড বিষণের নিশ্চিহ্ন তা আমি পরে জেনেছি। বাবলু মাস্টার কোন স্কুলের শিক্ষক নন। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে কিছু উপার্জন করে কোনোমতে বেঁচে ছিলেন। তাঁর বয়স অনুমান করা শক্ত। কারণ তাঁর সারা দেহে অকাল বার্ধক্য। পিঠ কুঁজোর মত বাঁকা। দেড়-দুই ঘন্টা তিনি আমাকে জলবাহিত ফ্লোরাইড ও তার তাণ্ডবের কথা বললেন। আমি মনোযোগ সহকারে সব নোট করলাম। সেই আমার ফ্লোরোসিসের প্রথম পাঠ। এক দিদি ছাড়া তাঁর অন্যান্য ৭/৮ জন ভাইবোন অকালমৃত। ২০০৯ সালের অক্টোবর নসিপুরে আবার গিয়ে জানলাম বাবলু মাস্টার প্রয়াত। বাঁকা পিঠের তাঁর জীবিত একমাত্র দিদিকে দেখলাম। দুবার-ই আর একজন ফ্লোরোসিস রোগী বিশ্বনাথ রবিদাসের (বয়স তখন প্রায় ৬৩/৬৪) সঙ্গে অনেকক্ষণ ছিলাম। তাঁর রোগযন্ত্রণার শুরু হয় আশির দশকের শেষ থেকে। তাঁক সব সময় শুয়েই থাকতে হয়। ভারী দেহ। বিছানায় এপাশ ওপাশ ফিরতেও তাঁকে তাঁর স্ত্রী বা ছেলের সাহায্য নিতে হত। চিকিৎসা ও নিরাময়ের জন্য তিনি রামপুরহাট, বর্ধমান হাসপাতাল থেকে শুরু করে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল পর্যন্ত ঘুরে, অনেক হয়রান হয়ে, শেষ পর্যন্ত একেবারে নিরাশ হয়েছেন। ২০০৯ সালের অক্টোবরে আমি আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করি। এই গ্রামটি ঝাড়খন্ডের সীমানায়। এই সময় আদ্রার কাছে খাইরি গ্রামেও দেখেছি, ফ্লোরোসিস দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ৭টি জেলার ৪৩টি ব্লকের নলকূপের জলে অত্যধিক ফ্লোরাইড।

ফ্লোরোসিস সম্পর্কে জানার ইতিহাস ঃ—

দাঁতের ফ্লোরোসিসের প্রথম আবিষ্কার বোধ হয় ইটালির নেপলস্ অঞ্চলে। সেখান থেকে আমেরিকায় আসা শিশুদের দাঁতের এলোমেলো ও ছোপ পড়া অবস্থা দেখা যেত। পরে বোঝা যায় সেগুলো শিশুদের শরীরে অত্যাধিক ফ্লোরাইড অনুপ্রবেশের ফল। ইটালির আগ্নেয়গিরি থেকে প্রচুর ফ্লোরাইড নির্গত হয়ে আঞ্চলিক জলভাণ্ডার ও মাটিকে দূষিত করত। সেই ফ্লোরাইডেই শিশুদের দাঁত এলোমেলো ও বিচিত্রিত হত। অনুরূপ ব্যাপার ১৯০১ সালে আমেরিকার কলোরাডো অঞ্চলে দেখেছিলেন ডঃ ফ্রেডেরিক সাম্নার ম্যাকে। দাঁতের এই ধরণের ছোপ পড়া অবস্থা 'কলোরাডো ব্রাউন স্টেইন' বা 'টেক্সাস টিথ' নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। ১৯০৯ সালে কলোরাডোর পাইক্স পিক অঞ্চলের স্কুলগুলিতে সমীক্ষা চালিয়ে ডঃ ম্যাকে ও তাঁর সহকর্মীরা দেখেন যে স্কুলের বাচ্চাদের ৮৭.৫ শতাংশ দাঁত 'মটলড', ছোপ পড়া। এ সবই মনুষ্যদেহে ফ্লোরাইডের প্রতিক্রিয়া। ফ্লোরিন রসায়ন ও ফ্লোরিন পরিমাপের আধুনিক পদ্ধতি (ফ্লোরাইড আয়ন সিলেকটিভ ইলেকট্রোড) তখন আবিষ্কৃত হয়নি। তাই ফ্লোরাইড গবেষণা তখন বেশি অগ্রসর হতে পারেনি।

ভারতে ফ্লোরোসিসের প্রথম আবিষ্কার হায়দ্রাবাদের নেলোর জেলার নালগোন্ডা গ্রামে, উনিশশো তিরিশের দশকের প্রথম দিকে। আবিষ্কারক আঞ্চলিক চাষিরা। চাষিরা দেখেছিল বলদ লাঙল টানতে টানতে এক সময় আর পারত না, পা মুড়ে ক্ষেতে বসে পড়ত। অন্য বলদ এনে জুড়লে কিছুদিন পর তারও একই দশা হত। ক্রমে অন্যান্য গ্রামেও এই সব ঘটনাবলী ঘটতে থাকল। মানুষের মধ্যেও এই ধরণের রোগের প্রকোপ দেখা গেল। তখন ইংরেজ আমলারা অনুসন্ধান করলেন। ফ্লোরাইড বিষণের ফলে এইসব হতে পারে এমন সন্দেহ প্রথম করেছিলেন ডঃ সি জি পণ্ডিত নামে একজন ভারতীয়। ঘটনাক্রমে তিনি বিখ্যাত ড্যানিশ ফ্লোরাইড বিশেষজ্ঞ কাজ রোহোলমের দুটি গবেষণা নিবন্ধ পড়ে অবহিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল নালগোন্ডার জলে লিটার প্রতি ১ থেকে ৩ মিগ্রা ফ্লোরাইড পাওয়া গিয়েছিল। সর্বোচ্চ পাওয়া গিয়েথিল ৬ মিগ্রা। অনুসন্ধানকারী ডঃ রবার্টস আক্রান্ত রোগীদের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে তাদের এক্স-রে পরীক্ষা করে ফ্লোরোসিস নির্ধারণ করেন। ফ্লোরোসিসের উপর প্রথম ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত ১৯৩৭ সালে কলকাতার জার্নালে (যা আমি আমেরিকার ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন থেকে সংগ্রহ করেছি)। জলবাহিত ফ্লোরাইডের মাধ্যমে ফ্লোরোসিসের গবেষণায় ভারতীয়রাই পথিকৃত। এখন ভারতে ফ্লোরাইডের গবেষণা কিছু কিছু হয়। তবে ইউরোপ আমেরিকাতেই বেশি (হু নির্দেশিকা সর্বোচ্চমাত্রা ১.৫ মিগ্রা/লিটার)।

লেখক ঃ ডঃ মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

ভেজাল খাদ্যের রমরমা ব্যবসা বন্ধ হওয়া উচিত

শিশু খাদ্য থেকে শুরু করে ঘি, মাখন, দুধ, ছানা, ভোজ্য তেল, মশলা, চা, মুড়ি, কফি, মিষ্টি, ওষুধ, চাল, আটা, ময়দা, সবুজ সব্জি (রঙ করা) সহ প্রায় সব খাবারই আজ ভেজাল যুক্ত।

প্রচার মাধ্যমে যেভাবে কোলা পানীয় বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তা চমক ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠান্ডা পানীয় শরীরে মারাত্মক ক্ষতি করে যথা ঃ—

১) এতে ফসফোরিক বা সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে যা দাঁতের ও পাকস্থলির ক্ষতি করে।

২) উচ্চচাপে যে কার্বন ডাই অক্সাইড মেশানো হয় তাতে পাকস্থলি থেকে হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড ক্ষরণ বৃদ্ধি করে। ফলে পাকস্থলি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৩) ক্যাফিন, ব্রোমিনোটেড ভেজিটেবিল অয়েল মেশানো হয়। এতে মাথা ব্যথা ও বমি হতে পারে।

৪) বিভিন্ন রঙ মেশানো হয় (যেমন কারমোজাইম টারটাজিন, সানসেট ইয়েলো)। প্রতিটি রঙই লিভারের মারাত্মক ক্ষতি করে।

সম্প্রতি বিভিন্ন স্টেশনের ঘুগনির বিভিন্ন নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর বহু উপাদান মেশানো হয়। রঙ করা চানাচুর ও কিশোরী রঙ মেশানো হয়। চটজলদি একটুনমুনা হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড দ্রবণে মিশ্রিত করলেই বোঝা যাবে এগুলিতে রঙ করা আছে। বাজারের বেশ কিছু জিলিপির নমুনা পরীক্ষা করলেও বোঝা যাবে এতে রঙ মেশানো হয়েছে।

দোকানে যেভাবে চাউমিন বিক্রি হয় তাতে আজিনামাটো মেশানো হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম মোনো সোডিয়াম গ্লুটামেট। এর নিজস্ব কোন গন্ধ নেই এটি আসলে গন্ধবর্ধক। বেশি খেলে পরিপাকের নানা সমস্যা দেখা দেয়। এর কারণে চাইনিজ রেস্তোরে সিনড্রোম বলে একটি রোগ হয়। প্রথমে গা-হাত-পা ঘাড়ে ব্যাথা হয় পরে চামড়া ঝুলে যায় অল্প বয়সেই বৃদ্ধদের মতো দেখতে লাগে।

বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাবারে যে রঙ গুলি মেশানো হয় যথা—

১) মিহি দানা, বোঁদে, লাড্ডু, বেবী ফুড, ডাল ইত্যাদিতে কিশোরি রঙ বা মেটানিল ইয়েলো মেশানো হয়।

২) জেলি, সস্, জ্যাম, লজেন্স, চকোলেট, শুকনো লংকাতে লাল রঙের জন্য কঙ্গোরেড ও রোডামিন বি মেশানো হয়।

৩) সবুজ সব্জিতে (পটল, ঝিঙে, উচ্ছে, পেঁপে প্রভৃতি) ম্যালাকাইট গ্রিন ও তুঁতে মেশানো হয়।

৪) মুড়িকে বেশি সাদা ও ফোলা করার জন্য ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়।

৫) ঘি, মাখন প্রভৃতিতে আলুসিদ্ধ ও ডালডা মিশেল দেওয়া হয়।

৬) দুধে জল, অ্যারারুট, আটা, ভাতের মাড়, ময়দা চিনি, বাতাসা ইউরিয়া মেশানো হয়।

৭) চায়ে লোহার গুড়া, ডালের ভুসি, পূর্বে ব্যবহার করা চা পাতা।

৮) সর্ষের তেলে ধুতুঁরা, শিয়াল কাঁটা বীজের তেল, রেড়ির তেল মিশেল দেওয়া হয়।

৯) কফিতে তেঁতুল বীজের গুড়ো, চামড়ার গুড়ো, পাউরুটির গুড়ো মেশানো হয়।

১০) মধুতে অ্যান্টিবায়োটিক সহ নানা ধরণের পিজারডেটিভ মেশানো হয়।

১১) চকচকে বেগুন, সবুজ করলা, পটল, লাল তরমুজ প্রভৃতিতে পোড়া মবিল মাখিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়।

প্রতিটি ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষের শরীর রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীনতার আগে নেহেরুজী বলেছিলেন ভেজালদারদের ফাঁসি দেওয়া হবে। ভেজাল ধরার দায়িত্ব রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ফুড ইনস্পেকটরদের। অথচ এই রাজ্যে এইপদ প্রায় শূন্য। সরকারী ভাবে খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা প্রায় বন্ধ আছে।

বিজ্ঞান সংস্থার সদস্যরা ভেজাল ধরার কায়দা বোঝাচ্ছেন। সর্বস্তরের মানুষের এখনই তৎপর হওয়া উচিত। ভেজাল রঙ থেকে যদি একটা আন্দোলন শুরু করা যায় তবে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। আর সামাজিক অপরাধগুলি সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

লেখক ঃ জয়দেব দে।

পড়ুন ও পড়ান
'এবং কি কে ও কেন'
(জনপ্রিয় বিজ্ঞানের জনপ্রিয় ত্রৈমাসিক)
যোগাযোগ ঃ- প্রকাশ দাস বিশ্বাস, কার্যকরি সম্পাদক 'এবং কি কে ও কেন'। মূল্য ঃ ১৫/-
গ্রাম ও ডাক - চালতিয়া, ভায়া বারুইপাড়া, জেলা-মুর্শিদাবাদ,
সূচক -৭৪২১৬৫, ফোন ঃ ৯৪৭৪৬৪৩৮৩৫

বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশিত
যখন পৃথিবী বিপন্ন
(পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন লেখার সংকলন) মূল্য ঃ ৬০ টাকা

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)
E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in
bijnandarbar1980@gmail.com